নেতাদের কাহিনী

শ্রীসোমনাথ ঘোষ

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্
১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬, আষাঢ়

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার বাগচী কর্ত্তৃক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৪নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও এইচ, এস, প্রেস
বরানগর, কলিকাতা হইতে শ্রীপুলিনবিহারী টাট
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র



মহাত্মা গান্ধি

দীপালীর সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

মহাত্মা গান্ধী ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

একবার মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চল হইতে একটি যুবক আসিয়া গান্ধীজীর দর্শন প্রার্থনা করিল। গান্ধীজী তখন সেবাগ্রামের আশ্রমে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তবু সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যুবকটি আসিয়া গান্ধীজীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কোন গোপনীয় কথা থাকিতে পারে মনে করিয়া এণ্ড্রুজ ব্যস্তভাবে উঠিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাঁহাকে সেখান হইতে উঠিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার সামনেই যুবকটিকে তাহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে বলিলেন।

যুবকটি তখন এইভাবে শুরু করিল—সে নিজে একজন দেশসেবক, বাল্যকাল হইতে কংগ্রেসের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। বর্ত্তমানে মাদ্রাজ অঞ্চলের একটি ছোট কংগ্রেস-কার্য্যালয়ের সে সম্পাদক। কিন্তু সম্প্রতি ভয়ানক বিপদে পড়িয়া সে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের তহবিল সে কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছে না। কংগ্রেসের কার্য্যেই যে সব টাকা খরচ করিয়াছে তাহার রসিদ সে

রাখে নাই বলিয়া এখন তহবিল মিলিতেছে না। এদিকে কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছে না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল এবং করুণ দৃষ্টিতে গান্ধীজীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

গান্ধীজী ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তিনি যুবকটির মুখের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য এবং সে একজন প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মী। তবু যুবকটিকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, এখন আমাকে তুমি কি করতে বলো ?

যুবকটি দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, আপনি যদি দয়া ক'রে একটু লিখে দেন তাহ'লে আমাকে আর ওই রসিদগুলি দেখাতে হয় না।

ইহাতে গান্ধীজীর কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার এই অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবো না। বরং এই অপরাধের জন্য তোমার দ্বিগুণ শাস্তি পাওয়া উচিত। প্রথমতঃ তুমি জনসাধারণের টাকা নিয়ে খরচ করেছো অথচ তার রসিদ রাখোনি! দ্বিতীয়তঃ তুমি সেই অপরাধ ঢাকবার জন্য আবার আমার কাছে এসেছো চিঠি নিতে!

যুবকটি গান্ধীজীর নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে নাই। সে ভাবিয়াছিল, গান্ধীজী দয়ার সাগর, সত্যকথা বলিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন। তাই ভয়ে তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে আবার ধীরে ধীরে বলিল, তাহ'লে আমাকে এখন কি করতে আদেশ করেন?

গান্ধীজী বলিলেন, এখনি দেশে গিয়ে যাদের কাছ থেকে জিনিস কিনেছিলে তাদের কাছ থেকে রসিদ সংগ্রহ করোগে।

যুবকটির চোখে অশ্রু ছলছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, সে ত অনেকদিনের কথা, মনে নেই কবে কা'র কাছ থেকে কি কিনেছি।

গান্ধীজী এবার ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, তাহ'লে যত টাকার হিসাব মিলছে না, তোমাকে পকেট থেকে তা দিতে হবে। পরের টাকা নিয়ে খরচ করেছো অথচ তার হিসাব রাখোনি, জানো তুমি লোকের সঙ্গে কতবড় প্রতারণা করেছো?

যুবকটির দু'চোখ দিয়া এবার ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি বড় গরীব, একটা পয়সা দেবার সামর্থ্য আমার নেই, সেইজন্য আপনার কাছে এসেছি কৃপাভিক্ষা করতে।

গান্ধীজী কণ্ঠে তেমনি দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া বলিলেন, এ ক্ষেত্রে কৃপা করার ক্ষমতা আমার নেই। জনসাধারণ

বিশ্বাস ক'রে তোমার কাছে যে টাকা দিয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ জনসাধারণকে দেখাতে তুমি আইনত বাধ্য। কাজেই ও-কথা ব'লে বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে, যা বলেছি তাই করোগে। এই বলিয়া তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া এণ্ড্রুজের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন।

যুবকটির মলিন বেশভূষার দিকে চাহিয়া এবং তাহার কণ্ঠের কাতর মিনতি শুনিয়া এণ্ড্রুজের কোমল হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর হৃদয়ের এই দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি এইরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতেছিল না। যুবকটিকে অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গান্ধীজী বলিলেন, আরো কিছু কি বলতে চাও তুমি ?

যুবকটি যেন এইবার কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষে মিনিটখানেক নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই, দেশে যাবার গাড়ীভাড়াটা যদি দয়া ক'রে দেন—

গান্ধীজী তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, আবার গাড়ীভাড়া চাইছো ! হেঁটে চ'লে যাও, তুমি যা অপরাধ করেছো তার শাস্তি যদি এতে কিছু হয় !

এবার যুবকটি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবাগ্রাম হইতে মাদ্রাজের দূরত্ব তখন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে গোপন করিয়া নিমেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরে আবার যেমন তিনি ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিলেন, গান্ধীজী অমনি ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, দীনবন্ধু, কোথায় গিয়েছিলেন ?

দীনবন্ধু বোধহয় কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় গান্ধীজী বলিয়া উঠিলেন, ছেলেটিকে গাড়ীভাড়া দিয়ে এলেন ত ?

দীনবন্ধুর মুখ এবার হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আপনি মহাত্মা, আপনি ত সবই বোঝেন, তবে আর প্রশ্ন করছেন কেন ?

গান্ধীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপনি যে দীনবন্ধু তাও সকলেই জানে !

এইভাবে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া সেদিন যে দুইটি মহৎ হৃদয়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইল, জগতের ইতিহাসে সত্যই তাহা দুর্লভ।

দরদী জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নাম শোনে নাই এইরূপ লোক বোধহয় এখন পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। আজ তিনি কেবল ভারতবর্ষের গৌরব নহেন, সারা জগতের গৌরব। তাঁহার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ এ যুগে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। জওহরলাল নেহেরুর নাম উচ্চারণ করিতে গেলে সকলে তাই আগে সম্ভ্রমে মাথা নত করে। স্বাধীন ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তিনি যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। সকল দেশের কূট রাজনীতিজ্ঞদের চোখে জওহরলাল তাই এক বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু এই পরিচয়ের চেয়েও তাঁহার আর একটি বড় পরিচয় আছে যাহার দ্বারা তিনি পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের অন্তর জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সে পরিচয় তাঁহার সাহিত্যের, তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার দর্শনের। সে পরিচয় চিরসত্যের। তাহার দ্বারা তিনি সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, মানবতার বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছেন। হয়ত একদিন মানুষ জওহরলাল, রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল, বাগ্মী জওহরলালের নামও এই পৃথিবীর

পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার এই পরিচয় চিরকাল অম্লানজ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া থাকিবে। এইখানে জওহর-লাল পৃথিবীর সকল রাজনীতিবিদ্‌দের ঊর্দ্ধে। এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একাধারে এতগুলি গুণের অধিকারী যে জওহরলাল তাঁহার দিকে চাহিয়া লোকে স্তব্ধ হইয়া যায়। জওহরলালের মধ্যে যেন বিভিন্ন ভাবের স্রোতস্বিনীর মহামিলন ঘটিয়াছে। স্বপ্নবিলাসী ও কবি বলিয়া, অনেকে মনে করেন জওহরলাল প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ববং তাঁহার কবিপ্রকৃতির জন্যই মনুষ্যত্বের অবমাননা তিনি কখনো সহ্য করিতে পারেন না। তাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালকে আমরা দেখিতে পাই নানা বিভিন্ন অবস্থায়, নব নব বিচিত্র রূপে।

একদিন দিল্লীর রাজপথ দিয়া মোটরে যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একজন স্ত্রীলোককে খুন করিবার জন্য দুইটি গুণ্ডা ছুরিকাহস্তে ছুটিয়া যাইতেছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং একটি উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্‌-ধাবন করিলেন।

বলা বাহুল্য তাঁহাকে দেখিয়াই দুর্বৃত্তরা শিকার ছাড়িয়া

পলায়ন করিল। এইভাবে তিনি সেদিন শুধু একটি নারীর জীবনরক্ষা করিলেন না, সমস্ত মনুষ্যসমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মনের বলের কাছে আসুরিক শক্তির পরাভব সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের অপমান যে সহ্য করে সে কাপুরুষ। বীর জওহরলালের মস্তকে সেদিন সমগ্র নারীজাতির আশীর্ব্বাদ অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল! ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, আজ এমন একজন দরদী ও মরমী কবিকে ভারত আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা-রূপে পাইয়াছে।

তাহা না হইলে, এই সভ্যজগতের কোন দেশ কি কখনো শুনিয়াছে যে, ভারতের যিনি আজ প্রধান মন্ত্রী, পৃথিবীব্যাপী যাঁহার যশ ও খ্যাতি, ভারতের ভাগ্যবিধাতা সেই সর্ব্বজনপূজ্য নেতা রেশনের দোকানের সম্মুখে যে সারিবদ্ধ জনতা অপেক্ষা করিতেছে তাহার পশ্চাতে গিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া আছেন! তিনি পরীক্ষা করিতেছেন সকলে সমানভাবে নিয়মিত খাদ্যশস্য পায় কিনা—কাহারো প্রতি কোন অবিচার করা হয় কিনা। এতবড় মানুষ হইয়া যিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় এমন অসঙ্কোচে এত সামান্য কাজও করিতে পারেন তিনি-ই জগতের আদর্শ নেতা। বর্ত্তমান পৃথিবীতে এ রকম নেতা আর কোথায়?



পণ্ডিত নেহেরু

দীপালীর সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

আবার, এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষটি যখন কাশ্মীর রণাঙ্গন পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন তখন রক্তাক্ত ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে কয়েকটি অম্লান শুভ্র 'ডেজি' ফুলকে ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ব্যথা লাগে। তাই তিনি সেই সুন্দব ফুলগুলিকে সযত্নে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়া গান্ধীজীর হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, এদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য যা ছিল তা এতক্ষণে শেষ হলো!

গান্ধীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমার কথাটা ত ঠিক বুঝতে পারলুম না।

জওহরলাল উত্তর দিলেন, এই সুন্দর ফুলগুলিকে যে দেবতার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়েছে।

এইবার গান্ধীজীর মুখমণ্ডল এক দিব্য জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিল। পণ্ডিতজী বলিলেন, কাশ্মীর রণাঙ্গনের একবিন্দু রক্তও এদের কলুষিত করতে পারেনি, তাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকে উপহার দেবার জন্য সেখান থেকে এদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

গান্ধীজী তাঁহার হাত হইতে ফুলগুলি লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলে জওহরলালের মুখচোখ এক অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীঅরবিন্দের অপরাধ

ভারতবর্ষে তখন প্রবল বৈপ্লবিক আন্দোলন চলিতেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য একদল বিপ্লবী গোপনে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইংরাজ শাসকদের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাই তাহাদের হাতে পাইলেই ভয় দেখাইয়া, অত্যাচার করিয়া, হত্যা করিয়া, তাহারা যেন প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইত। অবশ্য ভারতবাসীদের উপর বৃটিশ প্রভুরা দীর্ঘদিন ধরিয়া যে অকথ্য অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল তাহার তুলনায় উহা কিছুই নহে। তাই একদল লোক মনে মনে এই সব বিপ্লবীদের যেমন পূজা করিত, আবার এমন লোকেরও অভাব ছিল না যাহারা ইহাদের দেশের শত্রু বলিয়া মনে করিত।

শ্রীঅরবিন্দ তখনো ঋষিত্ব লাভ করেন নাই। তবে জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত। কোন্ পথে কত শীঘ্র স্বাধীনতা আসিবে তাহাই তিনি দিনরাত চিন্তা করিতেন।



শ্রীশ্রীঅরবিন্দ

দীপালীর সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

এই সময় একদিন ভোররাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া তিনি দেখিলেন পুলিশে তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। পুলিশের মনে কিরূপে এই সন্দেহ হইয়াছিল যে, তখন দেশে যেসব বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ চলিতেছে তাহার পরামর্শদাতা এই অরবিন্দ ঘোষ—বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁহার গোপন ষড়যন্ত্র আছে এবং তিনি তাহাদের দলের নেতা। তাই, রাইফেল, বন্দুক, গোলাবারুদ সহ বহু ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া হানা দিল। তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই অনুসন্ধানের ফলে তাহারা বহু মারণাস্ত্র অরবিন্দের বাড়ী হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। যত তাহারা ঘরের আনাচে কানাচে সব জিনিসপত্র তচনচ করিয়া সেই সব গোপনীয় অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান করিতে লাগিল তত ব্যর্থ হইল। কেবল বই. আর বই! ইহা ছাড়া আর যাহা পায় তাহা শ্রীঅববিন্দের জ্ঞানভাণ্ডারমন্থন-করা রত্ন—তাঁহার সুচিন্তিত রচনারাজি। ঘরের কোণে, খাটের তলায়, আলমারীর মাথায় গোয়েন্দা-পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজে, কিন্তু শুধু বই ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। নানা ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ—জগতেব শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শ্রেষ্ঠ সব অবদান।

এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা সহসা একটি ক্ষুদ্র কাগজের বাক্স আবিষ্কার করিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

আলমারীর মধ্যে বইয়ের আড়ালে অতি সযত্নে সেটি লুকানো ছিল।

বাক্সটি খুলিতে গিয়া তাহারা সভয়ে দূরে সরিয়া গেল। গুঁড়া একপ্রকার কি পদার্থ উহার মধ্যে ভর্ত্তি রহিয়াছে! উহা যে নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ, এ বিষয়ে তখন তাহাদের মনে আর কোন সংশয় রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সরকারী গবেষণাগার হইতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে আনাইয়া লইল। তাঁহারা বহু যন্ত্রপাতি সমেত ছুটিয়া আসিলেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষামূলক গবেষণা চালাইয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি উহা যে কোন তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহ রহিল না।

শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরিয়া এইবার নানারকমের জেরা শুরু হইল। পুলিশ কমিশনার সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন আরো বহু পুলিশ কর্ম্মচারী সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিতে লাগিল, সত্য ক'রে বলুন এই বস্তুটি কি, তা না হ'লে আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়া একই উত্তর বাহির হইল বারবার। যিনি ভবিষ্যতে ঋষি হইয়া সমগ্র পৃথিবীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন তাঁহার মুখ দিয়া কখনো কি মিথ্যা বাহির

হয় ? তাই, কখনো নানারূপ শাস্তির ভয় দেখাইয়া, কখনো পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে অন্য কথা তাহারা বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে পুলিশ কমিশনার সাহেব বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাহ'লে সত্যিকথা আপনি বলবেন না ত ? এই শেষবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—বলুন ওটা কি কোন বিস্ফোরক পদার্থ ?

শ্রীঅরবিন্দ ইহার উত্তরে তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, আমি যা বলেছি তা খাঁটি সত্য, ওর মধ্যে প্রথমও নেই, শেষও নেই।

ওটাকে কী বলেছেন আবার বলুন্ !—গর্জ্জন করিয়া উঠিল পুলিশের বড় সাহেব।

শ্রীঅরবিন্দ এবার বলিলেন, ওটা কোন বিস্ফোরক পদার্থই নয়। ওটা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পবিত্র মৃত্তিকা। আমি প্রতিদিন স্নান ক'রে ওই মাটি একটু ক'রে মাথায় স্পর্শ ক'রে মা কালীকে প্রণাম করি।

বটে !—আচ্ছা কোর্টে তাই প্রমাণ করবেন !—বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পুলিশ কমিশনার সাহেব তখনি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিল।

আশ্চর্য্য, এই অপরাধে শ্রীঅরবিন্দকে এক বৎসরের জন্য আলিপুর জেলের এক নিভৃত 'সেলে' বন্দী করিয়া রাখা হয় !

ধন্য ইংরাজের আদালত ! আর ধন্য তাহার বিচার !

মহারাজা ও বিবেকানন্দ

দেশভ্রমণ করিতে করিতে স্বামী বিবেকানন্দ একবার আলোয়ার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। আলোয়ারের মহারাজা তখন রাজধানীতে ছিলেন না, বন্ধুবান্ধব লইয়া বাহিরে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। আলোয়ারের সুযোগ্য দেওয়ান তখন যথাযোগ্য সমাদর সহকারে স্বামীজীকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দের আগমন-সংবাদ পাইয়া, ধনী হইতে দরিদ্র—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একেবারে দেওয়ানজীর প্রাসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে সেই গেরুয়া-পরিহিত দিব্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মুখের জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনিয়া অভিভূত হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া দেওয়ানজী স্বয়ং। তিনি তাঁহার এইরূপ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সেই অত্যাশ্চর্য্য সন্ন্যাসীর সহিত যাহাতে একবার মহারাজার দর্শন ঘটে তাহার জন্য এক কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ চিঠি দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন মহারাজা আসিয়া স্বামীজীর সহিত যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিলেন। দেওয়ানজী উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচয় করিয়া দিবার পর মহারাজা তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মহারাজা বলিলেন, আপনার মত এমন উচ্চশিক্ষিত ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কোনরকম উপার্জ্জনের চেষ্টা না ক'রে কেন যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান তা ত আমি বুঝতে পারি না!

স্বামীজীর চোখ দুইটি সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সব কথা সকলের বোঝবার জন্য নয়,—যেমন আমিও বুঝতে পারি না, আপনি এত বড় এক রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে, নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে সাহেবদের সঙ্গে দিনরাত বিলাস-ব্যসনে মেতে থাকেন কেন।

একজন সন্ন্যাসী যে মহারাজাকে মুখের উপর এইভাবে অপমান করিতে পারে তাহা কেহ ধারণাও করিতে পারে নাই। তাই উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ওদিকে দেওয়ানজীর মুখ ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। তিনিই যে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজাকে ডাকাইয়া আনিয়াছেন!

স্বয়ং মহারাজাও বোধহয় বিবেকানন্দের মুখ হইতে এতটা আশঙ্কা করেন নাই। তাই একটু ইতস্তত করিয়া তিনি বলিলেন, আমার খুসি, তাই আমি ওইরকম করি।

স্বামী বিবেকানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, আমারও তাই।

ইহার পর আবার দুইজনে আলাপ আলোচনা শুরু

করিলেন। এবং একটু পরে আবার সুযোগ বুঝিয়া স্বামীজীকে আঘাত করিবার জন্য মহারাজা রহস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা স্বামীজী, আমি ত আপনাদের এই পুতুলপূজো মানি না, তাহ'লে নিশ্চয় আমাকে নরকে যেতে হবে ?

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মহারাজার যে একটা দারুণ অবজ্ঞা ছিল তাহা বিবেকানন্দের বুঝিতে দেরী হইল না। তিনি তাই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন ?

মহারাজা বলিলেন, না, রহস্য নয়—তবে আপনাদের মত ওই কাঠ-খড়-মাটির মধ্যে যে দেবতা আছেন এটা আমি বিশ্বাস করি না।

স্বামীজী ইহার উত্তরে কিছু না বলিয়া শুধু নীরবে একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। তারপর একটু থামিয়া দেওয়ালে মহারাজার পিতার যে বড় ফটোখানি ঝুলিতেছিল তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া একজনকে উহা পাড়িয়া আনিতে বলিলেন।

একজন কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ ফটোখানি নামাইয়া আনিল। তখন স্বামীজী সকলের সামনে সেই ছবিখানিকে রাখিয়া এক এক জনকে আদেশ করিলেন উহার উপর থুথু ফেলিতে।

স্বামী বিবেকানন্দের এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া সবাই এবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। রাগে মহারাজা যেন ফুলিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজীর মুখ একেবারে কালি হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি স্বামীজীর নিকটে গিয়া বলিলেন, আপনি কী বলছেন! জানেন না ওটা যে আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজার ছবি?

স্বামীজী এইবার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে কহিলেন, জানি বলেই ত এই আদেশ করেছি। ওটা ত শুধু কাচ আর কাগজ—ওর মধ্যে ত ভূতপূর্ব্ব মহারাজার কোন অস্তিত্ব নেই, তাঁর রক্তমাংসও নেই—তবে কেন ওকে সম্মান করতে হবে?

এবার যেন মহারাজার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি স্বামীজীর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমায় ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ এবার বুঝতে পেরেছি।

স্বামীজী বলিলেন, এতে ক্ষমার কিছু নেই—তবে আপনি বলছিলেন আমাদের কাঠ খড় ও মাটির মধ্যে যে দেবতা আছে আপনি তা বিশ্বাস করেন না—এটা সেই কথারই জবাব!

মহারাজা বলিলেন, আজ আপনি আমায় দিব্য জ্ঞান দিলেন। আজ থেকে আমি আপনার শিষ্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

এই বলিয়া তিনি স্বামীজীর পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলেন।

প্রসন্ন হাসিতে স্বামীজীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সরোজিনী নাইডুর দৃঢ়তা

বারো বছর বয়সের শীর্ণ চেহারার মেয়েটি। ছিপ্‌ছিপে ভঙ্গুর দেহখানি দেখিলেই মনে হয়, বড় দুর্বল বড় অসহায়। তাহার দিকে চাহিলে শুধু চোখে পড়ে একজোড়া আশ্চর্য্য চোখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল অথচ কল্পনার স্বপ্নে তন্দ্রাতুর।

এই মেয়েটিকেই দেখিতে গিয়াছিলেন ডাক্তার বাবু। মেয়েটির বাবাকে তিনি বলিলেন, 'করেছেন কি! বারো বছরে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা ত দিয়েছে, আবার শুনছি মেয়ে কবিতা লেখে! এধারে শরীরটি যে ভাঙ্গতে বসেছে। এ রকম পরিশ্রম আর চলবে না, লেখাপড়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিন।'

ডাক্তার চলিয়া গেলে মেয়ের বাবাও মেয়েকে সাবধান করিয়া দিলেন। 'শুনলে ত মা? লেখাপড়া কিছু চলবে না এখন দিন কতক!'

মেয়েটির মন কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। লেখাপড়া বন্ধ থাকিবে সামান্য শরীরের জন্য! মনের চেয়ে, মস্তিষ্কের চেয়ে দেহটা হইবে বড়? কখনই না। এই সামান্য দৈহিক দুর্বলতার কাছে কিছুতেই তিনি পরাভব স্বীকার করিবেন না।

তিনি সেইদিনই বসিলেন আরও কঠোর তপস্যায়। দুইদিনে তেরো শ' লাইনের এক কাব্য রচনা করিয়া ফেলিলেন, তারপর আর এক সপ্তাহের মধ্যে দুইহাজার লাইনের এক নাটক! শরীর যত খারাপ হয়, তাঁহার সংকল্প ততই দৃঢ় হইয়া ওঠে। এই সামান্য কষ্টের উর্দ্ধে যদি তাঁহার মন উঠিতে না পারে ত' কিসের তাঁহার সৃজনী শক্তি, তাঁহার কিসের প্রতিভা! স্মরণ করেন তিনি জার্মাণ কবি শিলারকে, আরও বল পান মনে মনে।

এইবার কিন্তু তাঁহার শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাবা আসিয়া জোর করিয়া একটা ঘরে তাঁহাকে শোওয়াইয়া দিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিলেন। কাগজ কলম মেয়ের হাতে না পড়ে—লিখিতে আর না পারে কিছুদিন।

তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ঘরে কাগজ না থাকিলেও বই আছে,—মেয়েটি তাই বই পড়িতে শুরু করিলেন দিনরাত; শরীর না থাকে না থাক্, তিনি লেখাপড়া বিসর্জন দিতে পারিবেন না কিছুতেই।

অবশেষে শরীরই হার মানিল। তিনি লেখাপড়া বন্ধ করিলেন না একদিনের জন্যও।

এই মেয়েটিই অনেক বড় হইবার পরে—

বাইরের ঘরে নানা স্থানের স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছেন। কেহ আসিয়াছেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে—কেহ বা আসিয়াছেন রাজনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ চাহিতে।

এমন সময়ে অন্দর হইতে সংবাদ আসিল, 'মেয়ে খেতে চাইছে না কিছুতেই আয়ার হাতে'। তিনি ছুটিয়া তখনই গেলেন ভিতরে। পড়িয়া রহিল তাঁহার দেশের কাজ।

কী ব্যাপার? না, মেয়ে ঠাকুরের রান্না খাইবে না, আয়ার হাতেও না।

মা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বাহিরে বিস্তর স্ত্রী-পুরুষ অপেক্ষা করিতেছে। তখনই বসিয়া গেলেন নিজেই খাবার তৈরি করিতে। তারপর মেয়েকে কোলে বসাইয়া, কত আদর করিয়া সেই খাবার খাওয়াইলেন নিজে হাতে। তাহাকে শান্ত করিয়া বসাইয়া রাখিয়া আবার বাহিরে আসিলেন—বাহিরের সহস্র কাজ ও অসংখ্য লোকের মধ্যে।

এই মহিলাই হইলেন পুণ্যশ্লোক স্বর্গতা সরোজিনী নাইডু, ভারতবাসীর প্রিয়তম নেত্রী।

স্বভাবের এই দৃঢ়তার জন্যই তিনি কখনো কাহারো কাছে হার মানেন নাই—বহুবার কারাবাসের অজস্র দৈহিক কষ্ট ও সহস্র অসুবিধাতেও নহে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারই বারংবার হার মানিয়াছে তাঁহার কাছে। সমগ্র ভারত এবং

সুদূর আফ্রিকা ও বিলাতে তাঁহাকে দুর্বল দেহ লইয়া অনবরত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে সমস্ত রকম অনিয়মের মধ্যে, তবু দেহ তাঁহার কোথাও বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই।

আবার অত্যন্ত স্নেহকোমল জননীর মন লইয়াই সমগ্র দেশবাসীকে তিনি দেখিতেন নিজের সন্তানের মত; তাই দেশবাসীও তাঁহাকে সহজে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, তিনি ছিলেন তাহাদের অত প্রিয়। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সবাইকেই তিনি সমভাবে স্নেহের চোখে দেখিতে পারিয়াছিলেন, সকলেরই মঙ্গলচিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন।

সত্যবাদী গোখলে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁহাদের নাম সর্ব্ব-প্রথম লিখিত থাকিবে, গোখলে তাঁহাদের অন্যতম। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। দেশের কাজে তিনি গান্ধীজীকে সর্ব্বদা উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন এবং প্রেরণা জোগাইতেন। তিনি প্রথম হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই লোকটি সামান্য নন, তাঁহার মধ্যে

স্বদেশসেবার যে অত্যুগ্র কামনা লুক্কায়িত আছে যেদিন তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইবে সেদিন সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যাইবে! তাই তিনি গান্ধীজীকে সব সময় সকল কাজে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতেন। আর একজন মহাপুরুষের নাম এই স্থলে উল্লেখযোগ্য; তিনি হইলেন লোকমান্য তিলক। গান্ধীজীর উন্নতির পথে তিনিও সমানভাবে তাঁহাকে উৎসাহদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনে তাই শেষ পর্য্যন্ত অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব! তিলককে তিনি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বিরাট ও মহান্; দূর হইতে তাঁহার দিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকাইয়া থাকিতে হয়, কাছে যাইতে সাহসে কুলায় না।

অথচ গোখলেকে তিনি গঙ্গার পবিত্র ধারার মত বলিয়াছেন। তাহাতে অবগাহন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, মন পবিত্র হয়। তাঁহার সংস্পর্শে যেন মনের মালিন্য দূর হইয়া যায় এবং অন্তরে নব নব প্রেরণা আসে।

গান্ধীজীর মুখ দিয়া যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি বাহির হইয়াছে তিনি যে কতবড় ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই মহাপুরুষের সাহচর্য্য যাঁহারা লাভ করিয়া-

ছিলেন তাঁহারা ধন্য। আর ধন্য তোমরা যাহারা আজ তাঁহার পূত জীবনকাহিনী পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছ।

দেশ বলিতে শুধু তাহার মাটি, পাথর, গাছপালাকে বুঝায় না—তাহার ভৌগোলিক সীমাকেও বুঝায় না। দেশ তৈয়ারী করে দেশের মানুষ। দেশের এই অগণিত মানুষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা মহান্ তাঁহারাই দেশের গৌরব। তাই তোমরা যাহারা আজ স্কুলে পড়িতে আসিয়াছ—তোমাদের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে কত গান্ধীজী, কত গোখলে, কত জওহরলাল তাহা কে বলিতে পারে!

একদিন এই গোখলেও তোমাদের মত স্কুলে পড়িতেন এবং তোমাদের মতই বই খাতা লইয়া শিক্ষকের সম্মুখে লেখাপড়া করিতেন। একদিনের ঘটনা বলি। গোখলেদের ক্লাশে শিক্ষকমহাশয় আসিয়া তাঁহাদের সকলকে একটি অঙ্ক কষিতে দিলেন। অঙ্কটি বোধহয় একটু কঠিন ছিল। কেহই সেটি করিতে পারিল না। অথচ একমাত্র গোখলে ঠিকভাবে উহা কষিয়া দিলেন।

ইহাতে শিক্ষকমহাশয় অত্যন্ত সুখী হইয়া তাঁহাকে সকলের প্রথমে যাইয়া বসিতে বলিলেন। তখনকার দিনে এইভাবে ছাত্রদের ক্লাশে ওঠানামার পদ্ধতি ছিল। অর্থাৎ

যে ছাত্রটি ভালভাবে পড়া তৈয়ারী করিয়া ক্লাশে আসিত সে প্রথম বেঞ্চিতে প্রথম বসিবার সম্মান লাভ করিত।

কিন্তু গোখলে সেদিন শিক্ষকমহাশয়ের নিকট হইতে এইরূপ সম্মানলাভ করিয়াও নিজের জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহাতে তাঁহার সহপাঠীরা সকলে যেমন বিস্মিত হইল তেমনি হইলেন শিক্ষকমহাশয় স্বয়ং। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি আবার গোখলেকে বলিলেন, যাও তুমি সকলের প্রথমে বসোগে, পেছনের বেঞ্চিতে এখনো বসে রয়েছো কেন?

এইবার গোখলে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, এতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই, এই অঙ্কটি আমার বাড়ীর মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে আজ শিখে এসেছিলুম। তাই এর যা গৌরব তার সবটুকু মাষ্টার মশায়ের প্রাপ্য—আমার নয়।

গোখলের মুখ হইতে এইরূপ সত্যকথা শুনিয়া সবাই স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিক্ষকমহাশয় তখন তাঁহার এই সততার জন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্লাশ হইতে চলিয়া গেলেন।

বাস্তবিক যাঁহারা বড় হন বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের চরিত্রে কিছু না কিছু মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কেবল গোখলে নয়,

জগতের সমস্ত বরেণ্য নেতাদের জীবনী পাঠ করিলে তোমরা এই রকম আরো অনেক ঘটনা পাইবে।

শিক্ষাব্রতী তিলক

লোকমান্য তিলক ছিলেন সত্যকার দেশসেবক। দেশের লোকের প্রকৃত মঙ্গল কিসে হইবে সেই চিন্তাই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মন জুড়িয়া থাকিত। তাই আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া, এল্-এল্-ডি উপাধি লাভ করিয়াও তিনি ওকালতি করিতে যান নাই কিংবা কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। কম খরচে দেশের লোক যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়া নিজে উহাতে পড়াইতে থাকেন। এই স্কুলটির নাম 'নিউ ইংলিশ স্কুল'। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিলকের সঙ্গে তাঁহার আরো দুইজন বন্ধু এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম মিঃ আগারকার ও আর-একজন বিষ্ণুশাস্ত্রী। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত

এবং উভয়েই রত্নবিশেষ। তাঁহারা সকল রকমে তিলকের সহযোগিতা করিতেন।

কিন্তু দেশের লোকেরা এইরূপ শিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবকদের স্কুলে মাষ্টারি করিতে দেখিয়া হাসাহাসি করিত। তাহারা ভাবিত, বেশী লেখাপড়া শিখিয়া ইঁহাদের মাথাখারাপ হইয়া গিয়াছে, নচেৎ অর্থের অভাবে যাঁহাদের সংসার চলে না তাঁহারা কি করিয়া এইরূপ অল্প বেতনের কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন! এইরূপে যতই লোকেরা তাঁহাদের ঠাট্টা করিতে লাগিল ততই তাঁহাদের অধ্যবসায় ও উৎসাহ বাড়িয়া চলিল। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা দেশের সেবায় মগ্ন হইলেন।

কিছুদিন পরে আবার তিলকের মনে হইল কেবল স্কুলে শিক্ষা দিলেই দেশবাসীর শিক্ষা শেষ হইবে না—তাহাদের মনের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ করিতে হইবে। যাহাতে জাতির ও দেশের মঙ্গল বুঝিয়া সেইভাবে কার্য্য করিতে তাহারা উদ্যোগী হয়, দেশবাসীকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে সব শিক্ষাই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

সুতরাং কেবল স্কুল স্থাপন করিয়াই তিলক নিশ্চিন্ত হইলেন না, দুইখানি সংবাদপত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দেশবাসী যাহাতে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ ও ভাবের

আদানপ্রদান করিতে পারে এবং জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়—ইহাই ছিল তাঁহার মনের বাসনা। 'কেশরী' নাম দিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রথম একখানি সংবাদপত্র তিনি প্রকাশ করিলেন। মাতৃ-ভাষায় লিখিত এই সংবাদপত্রটি কেবলমাত্র দেশের জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা তিনি জানিতেন।

তাই 'মারহাট্টা' নামে ইংরাজী ভাষায় তিনি আর একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন, যাহাতে ভারতের সকল লোক ও ভারতের ইংরাজগণ এই কাগজের মারফৎ সমগ্র দেশ ও জাতিকে জানিতে পারে—তাহাদের সহিত ভালমন্দ নানারূপ আলোচনা করিতে পারে।

তিলকের ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই এই সংবাদপত্র দুইটি দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে।

সত্যকথা লিখিতে তিলক কখনো ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। একবার মিঃ বার্ভে নামক একজন ইংরাজ ব্যবসায়ী কোহলা-পুরের রাজার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন। তিলকের কানে সেই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তীব্র ভাষায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিলেন 'মারহাট্টা' ও 'কেশরী'তে।

ইহাতে মিঃ বার্ভে 'কেশরী' ও 'মারহাট্টা'র সম্পাদকদ্বয়ের নামে এক মানহানির মোকদ্দমা করেন।

এই দুই কাগজের সম্পাদক ছিলেন তিলক ও আগারকার। মানহানির মামলায় এই দুইজনের চারিমাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু দেশসেবার জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়া তাঁহারা কেহই দুঃখিত হইলেন না। দুইজনেই হাসিমুখে সেই দণ্ডাদেশ মাথায় তুলিয়া লইলেন।

ইহাতে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া তিলক ও আগারকারের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

দেশবাসীর নিকট হইতে এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া তাঁহাদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার হইল। 'কেশরী' ও 'মারহাট্টা' পত্রিকা তখন দেশবাসীর ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতে লাগিল। ওদিকে পুনার নিউ ইংলিশ স্কুলেও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইভাবে একদিন সত্যের জয় হইল। লোকমান্য তিলক, শিক্ষাব্রতী তিলক তখন দেশের প্রকৃত নেতা বলিয়া সকলের পূজা পাইতে লাগিলেন।

দৃঢ়চেতা সর্দ্দার প্যাটেল

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে লোকে 'আয়রন ম্যান' বলে। বাস্তবিক তাঁহার সম্বন্ধে এই উক্তি যে কতদূর সত্য তাহা যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা ভাল করিয়াই জানে। তাঁহার মত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়চেতা পুরুষ ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে অল্পই দেখা যায়। নির্ম্মম সত্যকে সহজকণ্ঠে প্রকাশ করিতে একবারও তাঁহার দ্বিধা নাই। যিনি যত বড়ই হউন, প্যাটেল কাহাকেও রেহাই দেন না। অন্যায়কে অন্যায় এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে তাঁহার লেশমাত্র ভয় নাই।

এই ত সেদিনের কথা, ভারতবর্ষ তখনো স্বাধীন হয় নাই, লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষের বড়লাট। সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট আহ্বান আসিল বোম্বাই হইতে আগষ্ট বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে সভাপতিত্ব করিবার জন্য।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘোর ঘনঘটা। কিন্তু তবু সর্দ্দার প্যাটেল এতটুকু বিচলিত হইলেন না। দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতির মত তখনি তিনি কর্ত্তব্য পালন করিতে ছুটিলেন।

এদিকে বিহারে যে সেদিন সকালে মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে সে খবর তিনি আগেই পাইয়াছিলেন। তাই

পতাকা অভিবাদন করিতে উঠিয়া প্যাটেল বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—'বিহারে আজ মহেন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় একজন যুবককে ফাঁসী না দিয়া দেওয়া উচিত ছিল লর্ড লিনলিথগোকে। আগষ্ট বিপ্লবের ঘটনাবলীর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী তিনিই!'

বলা বাহুল্য, সর্দ্দার প্যাটেলের এই নির্ভীকতায় সেদিন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল!

আবার, বল্লভভাই যখন ওকালতি করিতেন তখন সর্ব্বদা আসামীর পক্ষে দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার কঠিন যুক্তির কাছে প্রতিপক্ষকে প্রায়ই হার মানিতে হইত। এমন কি বিচারকরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভীতির চোখে দেখিতেন। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন তখন তাহা এইরূপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে করিতেন যে, কোন কারণেই তাঁহার সংকল্পচ্যুতি ঘটিত না।

একদিনের কথা বলি।—

সেদিন বল্লভভাই আদালতে একটি মামলা পরিচালনা করিতেছেন এমন সময় ডাকঘর হইতে তাঁহার নিকট একটি 'তার' আসিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই তারবার্ত্তাটি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। তারপর ধীর ও অবিচল চিত্তে আরো তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই মামলাটি পরিচালনা করিয়া যখন

দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন তখন সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, ওই তারবার্ত্তাটি সর্দ্দার প্যাটেলের স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল!

যিনি এইরূপ অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী তিনিই আজ স্বাধীন ভারতের অন্যতম কর্ণধার। তাঁহারই উপর ভারতের মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সর্দ্দার প্যাটেল। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন!

স্নেহপ্রবণ নেতাজী

রেঙ্গুন সহরের উপকণ্ঠে আজাদহিন্দ বাহিনীর ছাউনি পড়িয়াছে। ইহার জন্য অনেকখানি সমতল স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে নানা আকৃতির নানা ক্যাম্প। একদিকে সারি সারি অসংখ্য তাঁবু আজাদী ফৌজদের জন্য, আর একদিকে হাসপাতাল, গোয়েন্দা বিভাগের অফিস, গোলাবারুদ কামান প্রভৃতির সুরক্ষিত কত গুদাম। এখানে-ওখানে ছোট-বড় অসংখ্য অফিসারদের কোয়ার্টার। কত মোটর ট্রাক, কত বিমান,

কত শাস্তি-পাহারা! চারিদিকে বিরাট কর্ম্মব্যস্ততা, বিপুল তার আয়োজন!

নেতাজীর বাহিনী বিজয়-অভিযানে চলিয়াছে! পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেতার-বার্ত্তায় সেই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই অসীম সাহসী নেতাজীর বিচিত্র কাহিনী প্রতিদিন কত আশার সঞ্চার করিতেছিল পরাধীন ভারতবাসীর মনে। ওদিকে আবার আজাদহিন্দ ফৌজের ভয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভারতীয় সৈন্যদের হাতে তাহাদের বারংবার পরাজয় ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছিল।

সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! সামরিক আইন ও শৃঙ্খলার এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও ঘটিবার উপায় ছিল না।

এই সময় হঠাৎ একদিন কয়েকটি বৃটিশ বোমারু বিমান অতর্কিতে তাঁহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া পলাইয়া গেল।

হতাহতের সংখ্যার অবধি ছিল না। তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স কোর ছুটিল—ছুটিল ঝান্সীর-রাণী বাহিনী! হাসপাতাল ভরিয়া উঠিল আহতের ভীড়ে!

কিছুক্ষণ পরে নেতাজীকে দেখা গেল সেখানে। তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তারদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কোথাও এতটুকু চিকিৎসার ত্রুটি হইলে আর রক্ষা নাই! কেননা নেতাজী

নিজে রোগীর চিকিৎসা ভালভাবেই জানিতেন। কিভাবে রোগীকে শোওয়াইতে হয়, কখন্ কি ঔষধ বা ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয়, কোন্‌দিকে কেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়—সব শিক্ষা তাঁহার নখদর্পণে !

প্রত্যেকটি রোগীর বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি তাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রোগীদের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বোধহয় অন্তরে তেমনি ব্যথাই অনুভব করিতেছিলেন।

এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সংবাদ আসিল, শত্রুরা কেবল গোলাবর্ষণ করিয়া পলায় নাই, সীমান্তে সৈন্যসমাবেশও করিতেছে। কাজেই অবিলম্বে বেতারযোগে সেখানে নতুন সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির আদেশ পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আজাদহিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের স্বাক্ষর প্রয়োজন।

অথচ সুভাষচন্দ্রের কড়া হুকুম ছিল তিনি যখন হাসপাতাল পরিদর্শনে ব্যস্ত থাকিবেন তখন যেন কেহ কোন কাজ লইয়া তাঁহার নিকট না যায়।

একদিকে সর্ব্বাধিনায়কের আদেশ। আর একদিকে শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতি ! উভয়সঙ্কটে পড়িল সামরিক কর্ম্মচারীরা। কেহই সাহস করিয়া আদেশপত্রে স্বাক্ষর লইবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে চাহিল না। অথচ বিলম্ব ঘটিলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

অবশেষে দেবনাথ দাসকে সকলে অনুরোধ করিল সুভাষচন্দ্রের নিকট যাইতে।

তিনি প্রথমটা রাজী হন নাই। শেষে আরও বিপদের আশঙ্কায় তিনি এক সময় 'জয়হিন্দ্' বলিয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভ্রূকুটি করিয়া নেতাজী প্রশ্ন করিলেন, কি চাই?

দেবনাথ দাস ব্যাপারটি বলিতে বলিতে যেমন বগল হইতে ফাইল বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন অমনি সুভাষচন্দ্র ফাইলটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া ঘরের মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার দুই চোখে তখন অশ্রু ছল ছল করিতেছিল। তিনি বলিলেন, দেখছ না, মানুষ মরছে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে, আর এই সময় তুমি এসেছো ফাইল সই করাতে! মানুষ-ই যদি মরে গেল তবে কাদের জন্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা?

দেবনাথ দাসের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। নেতাজীর চোখের দিকে তাকাইয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন আহত সহকর্ম্মীদের প্রতি সমবেদনায় মন তাঁহার আর্ত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই আবার নিঃশব্দে ফাইলটি কুড়াইয়া লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং নীরবে তাঁহার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া বাহিরে আসিতে নেতাজীর আরো আধঘণ্টা সময় লাগিল। এইবার তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে দেবনাথ দাসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ফাইলটা তাঁহার হাত হইতে লইয়া সই করিতে করিতে বলিলেন, দেবনাথ, তুমি দুঃখ ক'রো না—ভেবে দেখো, আজ আমার মত দুঃখী কে? আমার সৈন্যদের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা আমি যে আর দেখতে পারি না! বলিতে বলিতে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের ক্যাম্পের দিকে চলিয়া গেলেন।

আবুলকালাম আজাদের কবিত্ব

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আবুলকালাম আজাদের নাম এইরূপভাবে জড়িত যে, তিনি শুধু একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু তিনি যে একদিন কত বড় কবি ছিলেন একথা অনেকেই জানে না।

বাল্যকালে কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা লিখিতেন এবং ওই অল্প বয়সেই 'নিরিংগি আলম্' নামে উর্দ্দুতে একখানি পত্রিকাও প্রকাশ

করেন। এই পত্রিকাটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, কেবলমাত্র কবিতাই তাহাতে স্থান পাইত এবং নবীন কবিদের কবিতাই বেশীর ভাগ ছাপা হইত।

আবুলকালাম এই সময় আবার উর্দ্দু কবিদের এক মজলিসে যোগ দিতেন। কলিকাতার গার্ডেনরীচ্ অঞ্চলে এই মজলিস বসিত এবং প্রায়ই সেখানে কবির লড়াই হইত। অর্থাৎ কোন একজন কবি মুখে মুখে কয়েক লাইন কবিতা রচনা করিয়া ছাড়িয়া দিলে, অন্য কবিদের তৎক্ষণাৎ তাহার বাকী অংশটি পূরণ করিয়া দিতে হইত। ইহাতে কাহার কিরূপ কাব্যপ্রতিভা সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যাইত। তাই এই উপলক্ষে কবিদের মধ্যে একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হইত।

আবুলকালামের বয়স ছিল তখন খুবই অল্প—তাঁহাকে কিশোর কবি বলা যাইতে পারে। তিনি এই সভায় নিয়মিত যোগদান করিতেন। এই সময় মুখে মুখে তিনি যে অত্যাশ্চর্য্য কবিতা রচনা করিতেন তাহা দেখিয়া অন্যান্য কবিদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এতটুকু ছেলে কি করিয়া এইরূপ উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করিতে পারে, এই লইয়া প্রবীণ কবিদের মধ্যে প্রবল আলোচনা শুরু হইত। বহু গবেষণার পর অনেকেই শেষে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিল যে, তিনি অন্য কোন বড় কবির

কবিতা মুখস্থ করিয়া আসিয়া তাহাদের নিকট নিজস্ব বলিয়া চালাইয়া দিয়া বাহাদুরি লন।

নাদির খান নামে যে বিখ্যাত কবি সেখানে আসিতেন তিনিই প্রথম এই কথাটি রটনা করিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি গালিবের শিষ্য। ওইটুকু বালক সভার মাঝে প্রায়ই তাঁহার মাথা হেঁট করিয়া দিত। তাই আবুলকালামের উপর আক্রোশটা ছিল তাঁহারই সবচেয়ে বেশী।

একদিন এই নাদির খান একটি পুস্তকের দোকানের সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আবুলকালামকে সেখানে দেখিতে পাইয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আবুলকালাম একখানি বইয়ের পাতা খুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি পড়িতেছিলেন।

নাদির খানের মনে সহসা তাঁহার উপর প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, তুমি ত মজলিসে গিয়ে খুব ভাল ভাল কবিতা রচনা করো, এখন আমি দু'টো কলি বলি, দেখি তুমি কেমন তাব পাদপূরণ করতে পারো!

এই বলিয়া একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, তা যদি পারো তবে বুঝবো তুমি একজন সত্যিকারের বড় কবি; তা না হ'লে জানবো যে সব ঝুটো—অন্যের চুরি করা মুখস্থ বুলি তুমি সভায় গিয়ে ব'লে আসো।

এই কথা শুনিয়া কবি আবুলকালামের মনে বড় আঘাত লাগিল। তিনি কখনো কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এইভাবে কোন একজন শিক্ষিতলোক তাঁহাকে অপমান করিতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাদির খানের সেই আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিলেন।

নাদির খান তখনি সেখানে দাঁড়াইয়া এইরূপ দুই লাইন কবিতা রচনা করিলেন—

ইয়াদ না হো, শাদ না হো,
আবাদ না হো……

তারপর আবুলকালামের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এর পরের ছত্রগুলি পূরণ ক'রে দাও ত বাপু ?

মুহূর্ত্তে যেন বাগ্‌দেবী তাঁহার কণ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন। কথার পর কথার মালা গাঁথিয়া এইরূপ সুললিত ছন্দে আবুলকালাম নিমেষে উহার শেষটুকু মিলাইয়া দিলেন যে, নাদির খান অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 'শোভনাল্লা' 'শোভনাল্লা' বলিয়া উল্লাসে ত্য করিতে লাগিলেন।

সেদিন এই তরুণ কবিকে বৃদ্ধ কবি যে সম্মানের জয়তিলক পরাইলেন আজও তাহা তেমনি অম্লান ও ভাস্বর হইয়া আছে। আজও উর্দ্দু কবিদের মধ্যে আবুলকালাম আজাদ এক বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করিয়া আছেন! শুধু কবি নন, তিনি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানতপস্বী। তাই স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সম্পূর্ণভার এখন তাঁহারই উপর ন্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথের প্রজাপ্রীতি

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বড় কবি বা বড় জননেতা ছিলেন তাহা নয়—তিনি জমিদার হিসাবেও আদর্শ ছিলেন। সে পরিচয় আমরা বারবারই পাই। তখনকার দিনের বিলাসী অপদার্থ জমিদারদের মত প্রজাদের সহিত মন্দ ব্যবহার কখনও করেন নাই—তাহাদের মানুষ ও ভদ্রলোক বলিয়াই ভাবিয়াছেন। এই গল্পটি শুনিলেই বুঝিতে পারিবে কী চোখে তিনি প্রজাদের দেখিতেন।

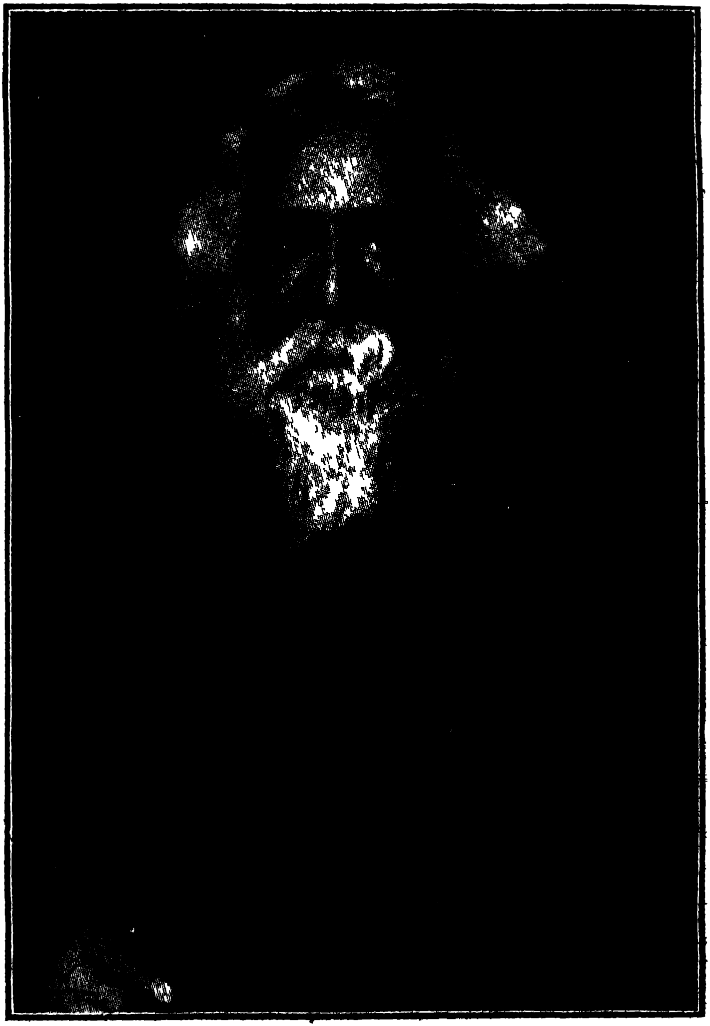
একবার তাঁহার দুইটি সম্ভ্রান্ত প্রজার মধ্যে জমির সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে। একজন প্রজা তখন মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য জমিদারের শরণাপন্ন হন। তখন নিয়ম ছিল, এখনও কোথাও কোথাও আছে যে—সেরেস্তায় কিছু টাকা জমা দিলে এই সব বিবাদের মীমাংসার জন্য জমিদারই আমীন পাঠাইয়া দিতেন, এবং সেই আমীন গিয়া মাপজোখ করিয়া সীমানা ঠিক করিয়া দিতেন।

এ ক্ষেত্রেও প্রজা আমীন পাঠাইবার খরচা জমা দিতে ম্যানেজার আমীন পাঠাইয়া দিলেন। আমীন বিবাদের আসল কারণ বুঝিতে না পারিয়া কোনমতে তাড়াতাড়ি একটি সীমা ঠিক করিয়া দিয়া আসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে প্রজাটি বলিলেন, কী ভাবে তিনি মীমাংসা করিলেন সেটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

আমীন নতুন লোক, অতশত জটিলতা তাঁহার মাথায় গেল না। শেষ পর্য্যন্ত ধমক দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা করিতে উভয় পক্ষে একটু বচসাও হইয়া গেল। আমীন দিলেন প্রজার 'জাতি' তুলিয়া গালি—প্রজাও যা-তা বলিয়া আমীনকে তাড়াইয়া দিলেন।

আমীন ফিরিয়া আসিয়া ম্যানেজারের কাছে প্রজার নামে নালিশ করিলেন। ম্যানেজার ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই কয়েকজন পাইক পাঠাইয়া দিলেন সেই প্রজাকে ধরিয়া আনিতে। প্রজাও ইহা জানিতেন যে, গ্রামে বাস করিয়া জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করা অত সহজ নহে। পাইকরা হয়ত বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, অপমানের শেষ থাকিবে না। প্রতিকার করিতে গেলে মকদ্দমা করিতে হয়; তাহাতেও নিস্তার নাই, যাহার পয়সা বেশী তাহারই জয়-জয়কার।

তখন সে প্রজা বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া লুকাইলেন।



কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাইকরা তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল এবং তাঁহার আত্মীয়দের উপর তম্বি করিতে লাগিল।

এমন সময় প্রজাটি একদিন খবর পাইলেন যে, জমিদার স্বয়ং আসিয়াছেন জমিদারী দেখিতে। মাইল কয়েক দূরে সদর কাছারী, সেখানেই নদীর উপর তিনি নৌকায় আছেন।

প্রজা তখন ঘুর পথে রাতারাতি হাঁটিয়া একেবারে জমিদারের নৌকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সব শুনিয়া তখনই ম্যানেজার ও আমীনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিতে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'দেখ, প্রজা টাকা জমা দিয়ে আমীন নিয়ে গেছে সীমানা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য—যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে, তুমি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য। তাতে ত রাগ করা চলে না।'

আমীন মুখখানা গোঁজ করিয়া বলিলেন, 'ও আমাকে অপমান করেছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'জমিদারের কর্মচারীকে অপমান করাও যা, জমিদারকে অপমান করাও তা।'

জমিদার বলিলেন, 'সেটা জমিদার বুঝবেন। কিন্তু আগে তুমি ওঁকে অপমান করেছ কেন?

আমীন বলিলেন, 'তাই বলে ও অপমান করবে আমাকে?'

'নিশ্চয় করবে! ও তোমার চেয়ে ছোট কিসে? খাজনা দিয়ে জমিতে বাস করে—এতে ওর পদমর্য্যাদা কম হ'ল? যাও, আবার গিয়ে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিয়ে এস। আর কখনও এমন করে আমার প্রজাদের অপমান ক'রো না। জমিদারের যেমন ইজ্জৎ আছে, প্রজাদেরও আছে, সেটা মনে রেখো।'

সত্যাশ্রয়ী পণ্ডিত মদনমোহন

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ছিলেন ভারতের সর্ব্বজনপূজ্য নেতা। ছোট হইতে বড় সবাই তাঁহাকে দেখিলে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিত এবং 'গোড় লাগি পণ্ডিতজী' বলিয়া তাঁহাকে আগে অভিবাদন করিত। বাস্তবিক পণ্ডিতজীর চেহারার মধ্যে এমন একটা পবিত্রভাব ছিল যে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি যেন কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা—এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীর সমস্ত নীচতা ও দীনতার ঊর্দ্ধে তাঁহার স্থান! কপালে শ্বেতচন্দনের তিলক, পক্ক কেশ, পক্ক গুম্ফ, মস্তকে শুভ্র পাগড়ী, সর্ব্বাঙ্গে তুষারধবল বেশ—যেন পবিত্রতার মূর্ত্ত প্রতীক! গুরুর মত সবাই তাই তাঁহাকে ভক্তি করিত; মন্ত্রশিষ্যেরও তাঁহার অভাব ছিল না।

তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ—শুদ্ধাচারী ও সত্যাশ্রয়ী। পূজা-আহ্নিক না করিয়া কোনদিন জলগ্রহণ করিতেন না। আজকালকার দিনে তাঁহার ন্যায় এইরূপ গোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রকৃতই দুর্লভ। তিনি কিরূপ কঠোর সত্যবাদী ছিলেন তাহার সম্বন্ধে একটি গল্প এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার এক বিশেষ জরুরী কাজে তাঁহাকে এলাহাবাদ যাইতে হয়। কিন্তু কাশী ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইতেই ট্রেণ আসিয়া পড়ে। ফলে তিনি আর টিকিট কাটিতে পারিলেন না, সামনেই যে প্রথম শ্রেণীর কামরাটি দেখিতে পাইলেন তাহাতেই উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে তিনি আগে টিকিট কালেক্টরের কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং কাশী হইতে এলাহাবাদের পূরা ভাড়ার টাকাটা দিয়া বলিলেন যে তিনি টিকিট কাটিতে পারেন নাই, কাশী হইতে আসিতেছেন।

টিকিট কালেক্টার কিন্তু ভাড়া না লইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল, ভাড়া দিতে হবে না, আপনি চলে যান।

পণ্ডিতজী ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, তা হয় না, আমি রেলকোম্পানীকে ফাঁকি দিতে পারবো না, তোমাকে নিতেই হবে ভাড়া।

টিকিট কালেক্টার এইবার একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু

আপনি কি গার্ড বা রেলের কোন কর্ম্মচারীকে আগে জানিয়েছিলেন যে টিকিট করতে পারেন নি ?

পণ্ডিতজী সরলভাবে উত্তর দিলেন, না।

তখন টিকিট কালেক্টর বলিল, তাহ'লে ত আপনাকে শুধু ভাড়া দিলে চলবে না, জরিমানাও দিতে হবে।

জরিমানা ! কেন ?—বলিয়া পণ্ডিতজী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন।

টিকিট কালেক্টর বলিল, ওই রকম আমাদের নিয়ম।

পণ্ডিতজী বলিলেন, কিন্তু আমি ত ফাঁকি দিতে চাইনি—নিজে এসেই বলছি যে টিকিট করতে পারিনি।

টিকিট কালেক্টর বলিল, তাহ'লেও জরিমানা লাগবে।

পণ্ডিতজী বলিলেন, তা হবে না। জরিমানা আমি কিছুতেই দেব না।

টিকিট কালেক্টর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহ'লে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী ইহাতে রাজী হইলেন না। অবশেষে বহু অনুরোধ সত্ত্বেও যখন টিকিট কালেক্টরকে ভাড়াটা লওয়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রেলকোম্পানীকে এইভাবে ন্যায্য ভাড়া হইতে বঞ্চিত করার জন্য তাঁহার বিবেক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।

তাই কাশীতে ফিরিয়া গিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম ছেলেকে টাকা দিয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন এবং একখানি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া তাহা ষ্টেশনেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন।

পট্টভী সীতারামিয়ার হিন্দীশিক্ষা

আগষ্ট বিপ্লবের আগুন যখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাতির সেই সঙ্কটমুহূর্ত্তে, ভারতবর্ষের নেতারা ছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সুসভ্য ইংরাজ সরকার দেশবাসীকে জানিতেও দেয় নাই কোথায় কোন্ জেলে, কোন্ সুদূর দেশে তাহাদের এইসব প্রাণপ্রিয় নেতারা বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা জীবিত কি মৃত সে সংবাদটি পর্য্যন্ত জানিবার অধিকার ছিল না ভারতবাসীর। হায় হতভাগ্য ভারত!

এই সময় আমেদনগর দুর্গে পট্টভী সীতারামিয়া ছিলেন বন্দী। দীর্ঘ বত্রিশ মাস তাঁহাকে সেইখানে কাটাইতে হইয়াছিল। অবশ্য এই সময় তিনি একা ছিলেন না। ভারতের জনপূজ্য আরো বহু নেতা ছিলেন তাঁহার সঙ্গে।

পট্টভী সীতারামিয়া ছিলেন তাঁহাদের দলের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি হিন্দী ভাল জানিতেন না। তিনি দক্ষিণী, দক্ষিণ ভারতের ভাষাতেই ছিলেন পণ্ডিত। অথচ তাঁহার বন্ধুবান্ধবরা সকলেই হিন্দী জানিতেন এবং অধিকাংশ সময় সকলেই হিন্দীতে আলাপ-আলোচনা চালাইতেন। তাই পট্টভী নিজের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা করিয়া হিন্দী শিখিতে শুরু করেন। পট্টভীর বয়স তখন প্রায় বাষট্টি বৎসর। কাজেই এই বুড়া বয়সে যতই তিনি পড়ায় মন বসাইতে চেষ্টা করেন কিছুতেই আর ভাল লাগে না। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে, যে তুলসীদাসী রামায়ণের মধুর ও ললিত ছন্দ শুনিলে মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায় তাহাও তাঁহার ভাল লাগিত না।—কিন্তু উপায় কি?

এই সময় হঠাৎ তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে এক চিঠি পাইলেন। চিঠিতে তাঁহার স্ত্রী লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড এখন তিনি পড়িতেছেন এবং তাঁহার ভারি ভাল লাগিতেছে। ইহা ছাড়া তিনি এই রামায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহা পড়িয়া সীতারামিয়া রীতিমত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এই লজ্জাই তাঁহার মনে দ্বিগুণ উৎসাহ আনিয়া দিল। তিনি আবার ভাল করিয়া রামায়ণ-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

আশ্চর্য্য, এইবার যেন তুলসীদাসের ছন্দ তাঁহার নিকট এক নূতন স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি পড়িতে পড়িতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাব এইবার মনে হইল যেন পৃথিবীতে এইরূপ মহাকাব্য আর দ্বিতীয় রচিত হয় নাই।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সেবাব্রত

ভারতের ইতিহাসে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী হিসাবে যে কয়টি লোক নিজ নিজ নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা ভারতবাসীর সম্মুখে মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগ, স্বার্থগন্ধহীন সেবাব্রত, অসাধারণ মনীষা এবং দেশবাসীর প্রতি ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে আন্তরিক ভালবাসাই ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। 'কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট য়্যাসেম্‌ব্লি' বা আইন-প্রণয়ন সভায় এবং ব্যবস্থাপরিষদে তাঁহাকে সর্ব্বজনসম্মতভাবে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া ঐ পূত-চরিত্র প্রবীণ নেতার প্রতি তাঁহার দেশবাসী তাহাদের কর্ত্তব্য কথঞ্চিৎ পালন করিয়াছে মাত্র।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের যে সব গুণাবলীর জন্য তিনি আমাদের অন্তরে অমর হইয়া থাকিবেন তাহার মধ্যে তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ও সেবাব্রতই প্রধান। চিরদিনই তিনি এই সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। যখন কলিকাতায় থাকিয়া আইন পড়িতেছেন কিংবা যখন প্রতিপত্তিশালী আইনজীবী হিসাবে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন—যখন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাক আসিয়া পৌঁছায় নাই, তখনও—তিনি পরের দুঃখ শুনিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। নিজের সর্ব্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি সেবাব্রতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে পারিতেন, আর্ত্তের আহ্বান ছাপাইয়া কোন স্বার্থের ডাকই তাঁহার কানে পৌঁছাইত না।

মনে পড়ে, বিহার-ভূমিকম্পের কথা। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিধাতার বিচিত্র বিধানে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্তর বিহারের কতক অংশ ধ্বংস হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হইল, সহস্র সহস্র লোক প্রাণ হারাইল। কত স্বর্ণপ্রসূ ভূমি ভূগর্ভস্থ বালুরাশিতে ঢাকা পড়িয়া চিরদিনের মত মরুভূমিতে পরিণত হইল। কত পরিবারের যে একমাত্র অবলম্বন মারা পড়িল কিংবা শেষ সম্বল ভূমিখণ্ড গভীর খাতে পরিণত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইহার মাত্র দুই একদিন পূর্ব্বেই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়াছেন। কারাদণ্ড ভোগের কাল পূর্ণ হওয়ায় নহে—এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার আর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিজেদের দুর্নাম বাড়াইতে সাহস করেন নাই। যদি কারাকক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয় ত পৃথিবীর লোকের কাছে কী জবাবদিহি করিবে ইংরেজ? সুতরাং ছাড়া পাইলেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন শয্যাশায়ী, উঠিয়া চলিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই।

এই অবস্থাতেও যখন ভূমিকম্পের সংবাদ তাঁহার কানে পৌঁছিল তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই তিনি উত্তর বিহারে গিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রকৃতির সেই সুবিশাল শ্মশানভূমিতে থাকিয়া চারিদিকের পীড়িত ও আর্ত্ত গণনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অত বড় স্থান জুড়িয়া কর্মক্ষেত্র,—অভাবের সীমা নাই, অসুবিধার অন্ত নাই। কত কর্ম্মীর প্রয়োজন, কত সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিছানায় শুইয়াই চারিদিকে আহ্বান পাঠাইলেন। কর্ম্মী আসিল, সাহায্য আসিল। শৃঙ্খলার সহিত অতখানি স্থানে সেবাকার্য্য চালানো প্রায় অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টাতেই তাহা ঘড়ির

কাঁটার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা এক দুরূহ ব্যাপার—কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের বলে তাহাও সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ প্রভৃতি মনীষিগণ দিকে দিকে আবেদন প্রচার করিয়া এই সেবাকার্য্যে প্রকৃত সাহায্য ও উৎসাহ জোগাইয়াছিলেন। বস্তুত সেদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ না থাকিলে কি যে হইত তাহা কল্পনা করাও যায় না।

কিন্তু সেদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেন কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখে নিজের কথা একবারও চিন্তা করেন নাই, এবং এমনই মনের বল যে, রোগদুর্বল দেহ সেদিন তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর সরলতা

আজ ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী। একদিন দিল্লীর যে সিংহাসনে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি ভারতের মহামান্য বড়লাট উপবিষ্ট ছিলেন আজ সেই স্থানটি ভারতের সর্ব্বজনবন্দিত এই নেতা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। বড়লাটের সমান পদমর্য্যাদায় আজ তিনি বিভূষিত।

স্বাধীন ভারত আজ তাঁহাকে এই গৌরবময় আসনে বরণ করিয়া লইয়াছে। তিনি কোটি কোটি ভারতবাসীর বন্দনীয়।

ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, তখন স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে বৃটিশ জাতির হাতে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি বহুবার কারাবরণও করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার প্রতিভার উল্লেখ করিতে গিয়া এই ইংরাজ প্রভুরাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাই একথা স্বীকার করিয়াছে যে তাঁহার তুল্য কূটনীতিজ্ঞ পুরুষ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই।

বাস্তবিক রাজনীতিতে এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এখন আর আমাদের দেশে নাই বলিলে কিছুমাত্র ভুল হইবে না। তিনি মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার দান তাই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর ন্যায় প্রতিভা সত্যই ভারতবর্ষে খুব বিরল। তিনি একদিকে যেমন বড় জননেতা, অন্যদিকে আবার তেমনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ও খাঁটি সমাজসংস্কারক। যা কিছু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তাহাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে কখনো পশ্চাৎপদ্ হন নাই। উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণ

হইয়াও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামী ছিল না। হরিজনকে, অস্পৃশ্যকে, বুকে তুলিয়া লইতে কখনো তাঁহার মনে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। মানুষের মধ্যেই তিনি মানুষের দেবতাকে দেখিয়াছেন, তাই সারাজীবন তাহার পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঋষিকল্পচরিত্র ও উদারহৃদয় এই রাষ্ট্র-পালের নাম শুনিলে সকলে সেইজন্য আগে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে তিনি মাদ্রাজের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু এইরূপ উচ্চ পদমর্য্যাদা পাইয়াও তিনি কখনো ভারতের আদর্শকে বিস্মৃত হন নাই। বিলাসিতা ও বেশভূষার চাকচিক্যকে তিনি চিরদিন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। তাই সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াছেন সকল সময়। এমন কি তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে যে যখন তিনি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী তখনো অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে নিজের হাতে সাবান দিয়া কাপড় কাচিতে। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁহার মিল দেখা যায়। তাই অনেকে আবার তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের গান্ধী নামে অভিহিত করে।

যাঁহাদের পূত চরিত্র স্বাধীন ভারতের ইতিহাসকে জগতের সম্মুখে আজ গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে শ্রীরাজাগোপালা-চারী তাঁহাদের অন্যতম।

নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহাত্মা গান্ধীর পূরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন গুজরাতের অন্তর্গত পোর বন্দরে। তাঁহার পিতার নাম কাবা গান্ধী। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কিছুদিন কলেজে পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। তারপব ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৯১ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু এখানে তিনি ব্যবসা জমাইতে পারেন নাই। ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর চাকরী লইয়া। সেখানে ভারতবাসীদের উপর ইংরাজদেব অত্যাচার চোখে দেখিয়া তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ফলে বহুবার সেখানে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ইহার পর ভারতবর্ষে আসিলে নেতা হিসাবে মহাত্মাজার নাম ছড়াইয়া পড়ে। তখন তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে সত্য ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর্শে ইহাকে অনুপ্রাণিত করেন। অহিংসা তাঁহার মূলমন্ত্র এবং সত্যাগ্রহ ও অনশন তাঁহার প্রধান অস্ত্র—ইহা লইয়া তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তারপর দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়া মহামানবের মত এই সত্যদ্রষ্টা পুরুষ অগ্রসর হইতে থাকেন ভারতেব স্বাধীনতার পথে। শাসকের বহু লাঞ্ছনা, নির্ম্মম অত্যাচার, কারাগারের

নৃশংস আচরণ—সব হাসিমুখে সহ্য করেন। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ, দৈন্য, পরাধীনতার যন্ত্রণা, সব যেন তিনি নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে এই ভারতের একমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তারূপে পূজা করিত। কংগ্রেস বলিতে তাই এই মহাত্মাজীকেই বুঝাইত। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে পরিচালিত বলিয়া আজ এই কংগ্রেস সারা পৃথিবীর চোখে এইরূপ মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সবরমতী আশ্রম ও সেবাগ্রাম আশ্রম তাঁহার আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯৪৩ সালে তিনি ইংরাজদের ভারত ছাড়িয়া যাইতে বলেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনের জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করেন এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়া আসে একমাত্র তাঁহার-ই প্রচেষ্টায়।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'হে রাম' 'হে রাম' উচ্চারণ করিতে করিতে বক্ষের শেষ রক্তবিন্দু ভারতবর্ষকে দান করিয়া তিনি চিরশান্তিময় লোকে চলিয়া যান।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইংরাজী ১৮৮৯ সনের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। জওহরলাল তাঁহার একমাত্র পুত্র। যখন তাঁহার পনেরো বৎসর বয়স তখন তিনি ইংলণ্ডে যান লেখাপড়া শিখিতে। ১৯১২ সালে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯২২-২৩ সালে প্রথম কারারুদ্ধ হন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

সম্পাদক হন ১৯২৩ সালে এবং ১৯২৯ সালে তিনি উহার সভাপতির পদগৌরব লাভ করেন। ইহার পর উক্ত সম্মানিতপদ তিনি আরো দুইবার লাভ করেন। স্বদেশী করিতে গিয়া তিনি সর্ব্বশুদ্ধ নয় বার কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে তিনি স্বাধীন ভারতের সর্ব্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত হন এবং এখনো উহার গৌরবমুকুট তাঁহার শিরে জাজ্বল্যমান ।

ঋষি অরবিন্দের নাম **শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ**। তিনি ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার মাত্র সাত বৎসর বয়স তখন তিনি বিলাত যান এবং সেখানে দীর্ঘদিন থাকিয়া লেখাপড়া করেন। কেম্ব্রিজের সেণ্টপলস্ স্কুলে ও কিংস্ কলেজে তিনি পড়িয়াছিলেন। এবং সেখান হইতে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও শুধু ঘোড়াচড়া জানেন না বলিয়া অকৃতকার্য্য হন। সেখান হইতে তিনি বরোদায় দেওয়ানের চাকরী লইয়া আসেন। তারপব বাংলাদেশে বাজনৈতিক আন্দোলনে আসিয়া যোগদান করেন। তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। আলিপুরের বোমার মামলায় তিনি জড়িত হইয়া পড়েন, তারপর উহা হইতে ছাড়া পাইয়া তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি পন্দীচেরীতে চলিয়া যান এবং সেখানে আশ্রম করিয়া তপস্তায় জীবন যাপন করিতে থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আসল নাম শ্রীনবেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তিনি

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। এবং সেখান হইতেই প্রথম বিভাগে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর মাত্র। একুশ বৎসর বয়সে তিনি জেনারেল এসেম্বলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় ছিলেন এটর্ণী, কাজেই নরেন্দ্রনাথও আইন পড়িতে আরম্ভ করেন! কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি আইন পড়া ছাড়িয়া দেন। কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করেন। অর্থশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৯৩ সালে ৩১শে মে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন 'সর্ব্বধর্ম্মমহাসভা'য় বক্তৃতা করিবার জন্য। তারপর সেখান হইতে ইউরোপে গিয়া বহু জায়গায় প্রায় সাড়েতিন বছর ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্তের প্রচার করিয়া বেড়ান। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন বাস করেন। এই সময় 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে খ্যাত ইংরাজ-মহিলা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদে। তিনি ছিলেন ঢাকা-জেলা-নিবাসী ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বাল্যকাল হইতেই সরোজিনী দেবীর মধ্যে কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁহার ছিল অসীম অনুরাগ। বারো বৎসরে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ষোল বৎসর বয়সে বিলাত যান উচ্চশিক্ষার জন্য।

সেখানে ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর ১৯১৬ সালে তিনি দেশের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং অসাধারণ বাগ্মিতার দ্বারা জনসাধারণের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইয়া দেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। দেশের কাজ করিতে গিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের পদগৌরব লাভ করেন। এই পদে অধিষ্ঠান করিতে থাকাকালীন ১৯৪৯ সালে সহসা সত্তর বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌর লাট প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোখলের পূরা নাম **গোপালকৃষ্ণ গোখলে**। ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার জন্ম হয়। পুণার নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় এই স্কুলটি ফার্গুসান কলেজে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী। ১৯০২ সালে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তর্কযুদ্ধে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিলভারত কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে গোখলের মৃত্যু হয়।

বালগঙ্গাধর তিলক—ইংরাজী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত রত্নগিরি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর পন্ত শাস্ত্রী; তিনি রত্নগিরি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিলক পুণায় আসেন এবং সেখানেই

সারাজীবন বাস করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুণা ডেকান কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে বি, এ পাশ করেন। তারপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এল, ডি উপাধি পান। কিন্তু তিনি আইন ব্যবসায়ে না গিয়া 'নিউ ইংলিশ স্কুল' নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শিক্ষকতা করেন। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষায় 'কেশরী' নামে একখানি দৈনিক কাগজ বাহির করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে যান ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সভায় ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা করিতে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেসের জন্ম হয় তখন তিলক মারাঠা জাতির মধ্যে জাতীয় ভার উদ্বুদ্ধ করিবার কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই তিলক ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুজরাতের অন্তর্গত কেইরা জেলায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া পাঞ্চমহল জেলায় গোধরা কোর্টে ওকালতি করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দেশের কাজে নামেন মহাত্মা গান্ধীর সহযোগীরূপে। এবং ইহার পর হইতে স্বদেশী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেন। আইন-অমান্য-আন্দোলন করিতে গিয়া ১৯৪০—৪২ সালে কারাবরণ করেন। পুনরায় '৪২—'৪৫ সালে কারারুদ্ধ হন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি

নির্ব্বাচিত হন ১৯৩১ সালে। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

সুভাষচন্দ্র বসু—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী কটক শহরে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতাব নাম শ্রীজানকীনাথ বসু। তিনি ছিলেন কটকের সরকারী উকিল। সুভাষচন্দ্র কটকে জন্মিলেও তাঁহার দেশ কিন্তু বাংলা দেশের ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিলাত যান আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিতে। আই, সি, এস্ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন কিন্তু সে চাকরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন ও দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। 'প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্' কলিকাতায় আসিলে সুভাষচন্দ্র 'বর্জ্জন' আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ইহার জন্য তিনি ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহাই তাঁহার জীবনে প্রথম কারাবাস, যদিও ইহার পর আরো বহুবার তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হন। তিনবছর পর তিনি সেখান থেকে মুক্তি পান। এই সময় দেশের লোক তাঁহাকে বাংলার কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদে বরণ করিয়া লয়। তারপর ১৯৩২ সাল থেকে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বন্দীজীবন ভোগ করেন এবং এই সময় তিনি চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইয়া বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির হরিপুরা অধিবেশনে তিনি

সভাপতি নির্ব্বাচিত হন ১৯৩৮ সালে। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরেও তিনি পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু কোন রাজনৈতিক কারণে আবার সেই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বৃটিশ গর্ভমেণ্টের চোখে ধুলা দিয়া ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্ধান করেন। তারপর জার্ম্মাণী হইতে শুরু করিয়া ইটালী, জাপান, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বিরাট আজাদহিন্দ্ ফৌজ গঠন করেন এবং নেতাজীরূপে তাহার পুরোভাগে থাকিয়া ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চালান ও দিল্লীর লালকেল্লা দখল করিতে অগ্রসর হন। ইহার পর আর তিনি দেশে ফেরেন নাই। এক বিমান দুর্ঘটনায় নাকি তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালের······

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ—ইংরাজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মক্কা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল খায়র উদ্দীন; তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। আরব দেশে তাঁহার শৈশব কাটে। কায়রোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আল্ অজহার হইতে তিনি মাত্র উনিশ বৎসর বয়সেই সসম্মানে ইসলামী শিক্ষায় শেষ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি দার্শনিক, কবি ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পড়েন। তারপর খিলাফত আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেসে যোগদান করিয়া উহার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। দীর্ঘদিন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিখিলভারত কংগ্রেসকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন;

তারপর আবার হন ১৯৩০ সালে। এবং পুনরায় ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত তিনি এই গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারত-রক্ষা আইনে তিনি ১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৫ সালে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বন্দী ছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতেই তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল এই ঠাকুরবাড়ী। বরাবর তাহারি মধ্যে থাকিয়া বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে 'বনফুল' নামে একটি অপূর্ব্ব কাব্যোপন্যাস রচনা করেন এবং তাহা 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বয়স হইতেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভা দিনদিন পূর্ণতার দিকে চলিতে থাকে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র সতরো বৎসর বয়সে তিনি বিলাত যান এবং সেখানে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাহিয়া উদ্বোধন করেন। রাজনীতি হইতে দূরে থাকিলেও প্রতিটি আন্দোলন তিনি লেখনীব সাহায্যে যেভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রাচীন ভারতের আদর্শে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেন উহাই বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গান্ধীজী

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিয়া ডাকিতেন এবং কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'র জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যের 'নোবেল প্রাইজ' পান। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। বহুবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

পণ্ডিত **মদনমোহন মালব্য**—ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন মালবদেশের অধিবাসী, তাই মালব্য উপাধি হইয়াছে। মদনমোহন ছিলেন আইনজ্ঞ। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এল, বি ডিগ্রী পান। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আবার দ্বিতীয় বারের জন্য এই গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করেন। নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার নানা আন্দোলনে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষ কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। স্বদেশী করিতে গিয়া তিনি একাধিকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়াছিলে। কাশীর 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'ভারতমাতার মন্দির' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ডাক্তার **পট্টভী সীতারামিয়া** ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর অন্ধ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতেই তিনি কংগ্রেস

:যোগ দেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তারপর ১৯১৬ সালে ডাক্তারি পরিত্যাগ করিয়া নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। আবার ১৯২৯ সাল হইতে তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইংরাজী ভাষায় ১৯১৯ সালে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন, উহার নাম 'জন্মভূমি'। লবণ সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন এবং ইহার পর আরো দুই বার জেলে যান, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে। তারপর ভারত রক্ষা আইনে ১৯৪২ সালে নজরবন্দী থাকেন। তারপর ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

ডাঃ **রাজেন্দ্রপ্রসাদ** বিহারের অন্তর্গত সারণ জেলার জিরেডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইংরাজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯২৫ সালে তিনি 'এম এল্' পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বিহারেব যুবক আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পাণ্ডা, এবং বিহারী-ছাত্র-সম্মেলনেব নেতা। দুইবার তিনি নিখিলভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন প্রথম ১৯১৭ সালে চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়ে। তারপব অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২০ সালে ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া ...শর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ সালে তিনি কংগ্রেসের ...রণ সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তারপর নিখিলভারত কংগ্রেস ...টির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন দুইবার, ১৯৩৪ ও ১৯৩৯ সালে। স্বদেশী করিতে গিয়া তিনি বহুবার কারাবরণ করেন।

বর্ত্তমানে তিনি 'ইণ্ডিয়ান্ কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লি'র সভাপতির গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।

শ্রীরাজাগোপালাচারী—ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের অন্তর্গত সালেম জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আইন ব্যবসায় অল্পদিনেরই সুনাম অর্জ্জন করেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। দীর্ঘদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন। কংগ্রেস-শাসিত মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। অস্পৃশ্যতা ও মাদক দ্রব্য নিবারণ আন্দোলন তাঁহার চেষ্টায় বিশেষ ভাবে প্রসারলাভ করে। তিনি সুলেখক—ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়াছেন। অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের মন্ত্রী ও স্বাধীনতা অর্জ্জনের গোড়ার দিকে বাংলার গভর্ণর মনোনীত হন। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপালের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত।